OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 247 - 256
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 247 - 256
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

উনিশ শতক, ‘পথের পাঁচালী’ এবং কথক হরিহর রায়ের অপমৃত্যু

রাহুল পণ্ডা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়
Email ID : rahulpanda213@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
19th century Bengal, Renaissance, Economic and cultural shifting, land reformation, Emergence of city of Calcutta.

Abstract
Nineteenth century was the turning period for the Bengal's socio-cultural construct and establishment. It was also the time when mediaeval economic layout of Bengal took a hit and it turned into a new kind of feudalism thanks to the Permanent Settlement Rule passed by the then East India Company in 1793. Due to this economic transformation, city of Calcutta emerged as the newly settled conurbation of the state with the illumination of renaissance. Consequently all the prior affluent townships from Islamic reign like Berhampur, Murshidabad, Burdwan or Krishnanagar were compelled to get the backseat. These economic and political swaps also commuted the local people's understanding of social celebrations and rituals. Due to colonial education system and Victorian refinements, the cultural aspects of Calcutta and surroundings were briskly changed. The artists who were attached to old customs and practices started to get affected by this conveyance. Writer Bibhutibhusan Bandyopadhyay in his all-time classic 'Pather Panchali' (1929) tried to catch this Cultural transitions and the dilemma of an artist through the focal point of Harihar Roy. Harihar was father of Apu, the main protagonist of the novel. By his job description, Harihar was a 'Kathak' (kind of reciter). He usually performed some selected parts from the old texts like Puranas, Bhagabata, Chandi-kavya and Mangal-Kavya. His consumers were by and large wealthy families from rural Bengal. But the new wave of cultural changes in Calcutta started to overpower Harihar's line of work and job insecurity commenced to appear as the looming threat. In this article we will try to observe this particular cultural shock, changes and historical turn-arounds through the case of Harihar.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 247 - 256
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

> "কি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে!...
> ঝাড়লণ্ঠনের আলো-দোলানো বড় আসরে সে দেখিতে পায়, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে তাহার ছড়া, গান, শ্যামা-সঙ্গীত, পদ রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া গাওনা হইতেছে। কতদূর-দূরান্তর হইতে মাঠ ঘাট ভাঙিয়া লোকে খাবারের পুঁটুলি বাঁধিয়া আনিয়া বসিয়া আছে শুনিতে। দলের অধিকারীরা তাহার বাড়ী আসিয়া সাধিয়া পালা চাহিয়া লইয়া গিয়াছে।
> বাঃ, ভারী চমৎকার তো! কার বাঁধা ছড়া? – 'কবির গুরু ঠাকুর হরু-"[১] হরু ঠাকুরের? – না। নিশ্চিন্দিপুরের হরিহর রায় মহাশয়ের।"[২]

সাকিন নিশ্চিন্দিপুরের হরিহর রায়ের কবি হওয়ার এই স্বপ্ন, এই ভবিষ্যৎ জল্পনা, প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নেই; কিন্তু সত্যি নয়। জীবিকার ফন্দিফিকিরে একাধিকবার হরিহর কবি হওয়ার পরিকল্পনা ভেঁজেছে, খুঁজে বের করেছে যৌবনের গলিত-ছিন্ন কবিতার খাতাপত্র, খুব কষে ঠিক করেছে এবার সে কবির দল করবে, কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছু ঘটেনি। কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা, গানের দল তৈরি, শিল্পী হিসেবে খ্যাতি বা স্বীকৃতির সামান্য খুদকুটোও তার আয়ত্তের বাইরে থেকে গেছে। এমনকী চেষ্টা করে দেখার সুযোগটুকুও সে পায়নি। মধ্যচল্লিশে আকস্মিক মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে যাবতীয় স্বপ্নপূরণের সম্ভাবনা। শুরুর আগেও যে শুরু থাকে, প্রস্তুতি আর পরিশ্রমের রোজনামচা থাকে, সেই প্রাকচর্চা হরিহরের ফুরিয়ে গেছে নিছক স্বপ্নসন্দর্শনেই। বস্তুত, গঙ্গার ঘাটে সামান্য দু-চারদিন কথকতা, পুঁথি-পাঠ, আর কতিপয় পালা রচনাতেই হরিহরের স্বল্পস্থায়ী কবিজীবনের ইতি।

অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। অন্তত হরিহর এই পরিণতির কথা ভাবেনি। কবি হওয়া তার বহুদিনের লালিত স্বপ্ন। বিবাহের পরে বছর দশেক যখন বাউন্ডুলে জীবনযাপন করছে হরিহর, অনিশ্চিত চাপল্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে অজানা আর্যাবর্তে, তখনও সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও, শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক জোরালো ইচ্ছে তাকে ক্রমাগত তাড়িত করেছে। গ্রামে ফিরে পরিবার প্রতিপালনের প্রতিবন্ধকতায় খানিক বিচলিত হয়েছিল সে, কিন্তু কবি হওয়ার আগ্রহ তাতে ব্যাহত হয়নি, বরং আরও তীব্র হয়েছে। চারদিকে '...দাশুরায়ের গান, দেওয়ানজীর গান, গোবিন্দ অধিকারীর শুকসারীর দ্বন্দ্ব, লোকা ধোপার দলের মতি জুড়ির গানের বিস্তৃত প্রচলন ও পসার' [৩] -এ তার শিল্পীমন ক্রমাগত উত্তেজিত হচ্ছিল, উর্বরও। হাটে-বাজারে সমকালীন কবিগান দেখে আলগা একটা ভরসা এবং আত্মবিশ্বাসের জায়গাও যেন তৈরি হচ্ছিল, এসবের তুলনায় উৎকৃষ্ট পালা-গান রচনার ক্ষমতা সে ধরে।[৪] মনে হয়েছিল অপেক্ষা আর সামান্যই, গৃহস্থালির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ঈষৎ গুছিয়ে নিতে পারলেই পুরোদস্তুর কবি হওয়ার চেষ্টা শুরু করা যাবে।

কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই। তা মূলত অলীক, বাস্তবের পাটিগণিতে মেলে না। হরিহরের দুর্ভাগ্য, তার ক্ষেত্রে জীবনের ত্রৈরাশিক আরও কঠিন ছক নিয়ে হাজির হয়েছিল। প্রথমে নিশ্চিন্দিপুরে ঘর-গেরস্থালির চেষ্টা, তারপর কাশীতে থিতু হওয়ার প্রয়াস, উভয়ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয় সে। হরিহর চেষ্টা করেনি এমন নয়, কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল ছিল। বস্তুত, উনিশ-বিশ শতকের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক খাত বদলের প্রবণতা হরিহরের সম্পূর্ণ বিপক্ষে গিয়েছিল। এই দ্বিমুখী খাতবদলই বর্তমান প্রবন্ধের মূল উপজীব্য, পরে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে, আপাতত এটুকু জানানোই যথেষ্ট যে উপনিবেশিক বাংলাদেশের চরিত্র তার পূর্বতন প্রজন্মগুলির তুলনায় ক্রমশ পৃথক হয়ে যাচ্ছিল, এবং তার মাশুল গুনতে হয়েছিল হরিহরের মতো নিম্নবিত্ত শিল্পী মানুষদের। উনিশ শতকের গ্রামবাংলা তাদের মাথার উপর ছাদটুকু নিশ্চিত করতে পারেনি, ফলে অবধারিত উচ্ছেদ হওয়া ছাড়া তাদের সামনে উপায় ছিল না তেমন। অথচ রাজধানী কলকাতা তখন নবজাগরণের উত্তাপে, বিচিত্রগামী সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে সেঁকে নিচ্ছিল নিজেদের। কিন্তু কলকাতা থেকে সামান্য দূরেই পল্লী, জনপদ বা গ্রামগুলি হারিয়ে যাচ্ছিল প্রদীপের পেছনকার অন্ধকারে। হারিয়ে যাচ্ছিল হরিহরেরা। কীভাবে, তা দেখে নেওয়া যাক।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 247 - 256
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একটা বিষয় প্রথমেই পরিষ্কার বুঝে নেওয়ার দরকার আছে, নিশ্চিন্দিপুর থেকে হরিহর-সর্বজয়াদের উদ্বাস্তু হওয়া কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পিতৃপুরুষের ভিটে খুইয়ে বহু পরিবারই তখন অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াচ্ছিল। বলা ভালো বাড়াতে বাধ্য হচ্ছিল। তুলনাহীন কোম্পানির শাসনে নির্বিচার শোষণ প্রক্রিয়ায় যত কুফল ফলেছিল, তার মধ্যে এই বাস্তুত্যাগ নিকৃষ্টতম। এত সংখ্যক মানুষের ছিন্নমূল আশ্রয়হীনতা ইতিপূর্বে কদাচিৎ দেখা গেছে। এর কারণ বিবিধ, সমালোচকরা বিভিন্ন সময় সেসব আলোচনা করে দেখিয়েছেন। তবে সৌজন্যের খাতিরে নাম নিতে হলে বলতে হয় দুটি অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং দশশালা আইন। যাদের সময়োপযোগী প্রয়োগ এবং সুচারু রূপায়ণের মাধ্যমে উপমহাদেশের তৎকালীন গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থাকে কোম্পানি ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল।

দশশালা এবং চিরস্থায়ী, নামে আলাদা হলেও, আদপে এরা একই আইন। দুটি ক্ষেত্রেই একটা দীর্ঘসময় জমির স্বত্ব ছেড়ে দেওয়া হত জমিদারদের হাতে। দ্বিতীয়ত, জমির মালিকানাও হাতবদল হত। চাষির কাছ থেকে তা চলে যেত জমিদারের কাছে, চাষির ব্যক্তিগত ভূমিখণ্ড বলে কিছু থাকত না। মানে খাতায়-কলমে থাকত, কিন্তু বকলমে জমি হাতছাড়া হয়ে যেত। কীভাবে? বিনয় ঘোষ চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন,

> “...জমিদারেরা ইংরেজের আমলে গোত্রান্তরিত হলেন। তাঁরা আগে ছিলেন রাজস্বআদায়কারী, জমিজমার উপর কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা তাঁদের ছিল না, যদিও বংশানুক্রমে তাঁদের অধিকার এবং প্রভাবপ্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকত। এখন তাঁরা হলেন জমির মালিক...জমিদারী তাঁদের মূলধনে পরিণত হল। আগে দেশীয় প্রথানুসারে খোদ্‌কস্ত প্রজাদের বংশানুক্রমে চাষের ও বাসের ভূমির উপর যে অধিকার ছিল তা নতুন ব্যবস্থার ফলে রইল না। জমিদারেরা প্রজাদের উচ্ছেদ করা ও খাজনাবৃদ্ধি করার পূর্ণ অধিকার পেলেন।”[৫]

অর্থাৎ কিনা জমি মাত্রেই জমিদারের, চাষ করা ভিন্ন কৃষকের অধিকার সেখানে শূন্যের গুণিতকে। বাংলাদেশকে সেসময় টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন মাপের জমিদারি-পরগনায় ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয়। আবাদী-অনাবাদী সব জমিই সেখানে ঢুকে পড়ায়, জমির পরিমাণ এক লাফে বেড়ে গেল অনেকখানি। এই সব জমি থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব ধার্য করা হয়। যদিও রাজস্ব কীভাবে সংগৃহীত হচ্ছে, তা নিয়ে কোম্পানি চিন্তিত ছিল না। সে দায় সংশ্লিষ্ট পরগনার জমিদারের, শুধু হিসেবমতো সংগৃহীত রাজস্বের দশভাগের নয়ভাগ কোম্পানির গোলাঘরে তুলে দিতে পারলেই হল। যদ্দিন রাজস্ব ঠিক সময়ে এবং পরিমাণমতো জমা পড়ছে, তদ্দিন জমিদারি থাকবে, নইলে ডিক্রি জারি করে নিলামে বেচে দেওয়া হবে। তখন আবার নতুন জমিদার, নতুন শাসক, জমি তখন তার। ঠিক সময়ে রাজস্ব না দিতে পারার কারণে এই সময় একের পর এক বনেদী জমিদার পরিবারগুলির সম্পত্তি ডিক্রিজারি হচ্ছিল।[৬] সে সম্পত্তি আবার কিনে নিচ্ছিলেন কলকাতার উঠতি বড়োলোকরা, যাঁরা মূলত ব্যবসাদার-বেনিয়া-ইংরেজদের মুৎসুদ্দি, জমির সঙ্গে যাঁদের বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই।[৭] তাঁরা জমিদারি থেকে টাকা পেয়ে খুশি ছিলেন, কীভাবে সে টাকা আসছে তা নিয়ে চিন্তিত নয়।[৮]

এর ফলাফল ভয়ংকর হয়েছিল। রাজস্ব আদায়ের জন্য, “...জমিদারেরা বহু ক্ষুদে মালিক সৃষ্টি করলেন। পত্তনিদার দরপত্তনিদার গাঁতিদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা বেড়ে গেল। সাইমন কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, একএকটি জেলায় ৫০ জন পর্যন্ত মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হল।”[৯] মূলত এই মিডলম্যানদের অকথ্য অত্যাচারেই বাংলাদেশের এতদিনকার গ্রামীণ অর্থনীতি মাত্র অর্ধশতাব্দীর মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। এত সংখ্যক খুদে মালিকের আর্থিক খাঁই পূরণ করার সাধ্য নিম্নবিত্ত কৃষক পরিবারগুলির ছিল না। ফলে জমি-বাটি-জীবিকা খুইয়ে দলে দলে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে ভিড় বাড়াতে শুরু করে।

এটা একটা দিক, যেভাবে গ্রামীণ আর্থিক কাঠামোটি ভেঙে পড়ল। আর একটি দিক ছিল সাংস্কৃতিক রদবদল। মধ্যযুগীয় যে বিনোদনের উপাদানগুলি আঠারো শতক পর্যন্ত জারি ছিল, তারা উনিশ শতকে মূল্যহীন হয়ে যেতে শুরু করে। সেসময় নগর কলকাতার পত্তনে, অর্ধশিক্ষিত মানুষ আর কাঁচা টাকার উল্লাসে, বিচিত্র সব দোআঁশলা সংস্কৃতির জন্ম হচ্ছিল। এর মধ্যে কিছু কিছু আমাদের চেনা, যেমন কবিগান, আখড়াই, হাফ-আখড়াই গোপাল উড়ের যাত্রা, দাশুরায়ের পাঁচালী, সখের গান ইত্যাদি। এগুলির প্রাথমিক শিকড় একসময় ছিল গ্রামের বটতলা, শীতলার থান, বা চণ্ডীমণ্ডপে, পরে মুদ্রার

ঝনঝনানিতে তারা হাজির হয় কলকাতায়। চেহারা বা চরিত্রে যেটুকু গ্রাম্যতা ছিল, তা নগরের জলহাওয়ায় খসে পড়ে। চটুল অলংকার, বিলোল কটাক্ষ, আর ভাষার মার্জনায় তারা বিচিত্র আবেদন নিয়ে জাঁকিয়ে বসে কোম্পানির রাজধানীতে। এবং মজার বিষয়, কলকাতা জয় সমাপ্ত করে পুনরায় তারা ফিরে যায় ফেলে আসা গ্রামবাংলাতেই। যদিও নতুন চেহারায়, আরও আকর্ষণীয় দেহলিতে, জেল্লার ঝলসানিতে তখন তাদের থেকে চোখ ফেরানোই দায়।

উলটোদিকে গ্রামীণ সংস্কৃতিতে একটা একঘেয়েমির পরিবেশ দীর্ঘদিন ধরেই বজায় ছিল। একই ধরনের লোককথা, পুরাণপাঠ, মঙ্গলকাব্যে সাধারণ মানুষ বেশ খানিকটা বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল। ফলে এই নতুন বিনোদনের উপাদানগুলি সেখানে সাদরে গৃহীত হতে শুরু করে।[১০] সাবেক হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনায় গজিয়ে ওঠে নতুন নতুন কবি, পাঁচালীর দল। যুগের হাওয়ায় বৈষ্ণব কীর্তনের ধাঁচ পালটে যায়, প্রচলিত কেষ্টযাত্রা ভেঙে বেরিয়ে আসে আকর্ষক কালীয়দমন পালা। স্বভাবতই এই পালাবদলের ঝোঁকে (এবং কিছুটা দর্শক রুচির দাবিতেও), গ্রামীণ সংস্কৃতিতে গুরুতর ধোয়ামোছা শুরু হয়। কথকতা, পুরাণপাঠ শোনার লোক কমে; অর্বাচীন সংস্কৃতির দাপটে এরা ক্রমশ প্রান্তিক বলে গণ্য হতে শুরু করে। এভাবেই যা কিছু পুরাতন, যা কিছু 'সেকাল'-এর সংস্কৃতির উপায় ও অবশেষ, তা বাতিলের খাতায় জড়ো হয়।

এই দুই প্রেক্ষিতে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পালাবদলের নিরিখে, আমরা নিশ্চিন্দিপুরের ভূমিহীন ব্রাহ্মণ কথক হরিহর রায়কে বিচার করে দেখতে পারি। সেই সঙ্গে পরিস্থিতি অনুযায়ী হরিহর নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছিল কিনা, তাও খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

৩

বিবাহের ঠিক পরেই স্ত্রী সর্বজয়াকে ফেলে হরিহর দশ বছর বেপাত্তা হয়ে যায়। কোনো খোঁজ ছিল না, যদিও ইন্দির ঠাক্‌রুণের জন্য মাঝে-সাঝে মানিঅর্ডারে দু-পাঁচ টাকা পাঠিয়ে দিত সে। পরে জানা যায় এই সময়ে হরিহর কাশীতে ছিল। সেখানে শাস্ত্রশিক্ষা করেছিল, সংস্কৃত শিখেছিল, কথকতার পাঠ নিয়েছিল। এক যুগ বাদে গ্রামে যখন 'শিক্ষিত' হয়ে ফিরল হরিহর, তখন সবাই আশ্বাস দিল তার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। যা জেনে-পড়ে এসেছে তাতে পরিবার প্রতিপালন করতে সমস্যা হবে না, প্রতিষ্ঠা পেতেও নয়। সর্বজয়া আর ইন্দিরকে নিয়ে হরিহর নিশ্চিন্দিপুরে স্থায়ী বসবাস শুরু করল, একটি মেয়ে হল, দুর্গা।

যে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আশ্বাস ছিল, তা কিন্তু মিলল না। মিলল না কারণ হরিহরের শিক্ষা এবং জীবিকার উপায়গুলি তদ্দিনে গ্রামে অবান্তর হতে শুরু করেছে। কথকতা, শাস্ত্রকথা কোনো কিছু শোনারই লোক গ্রামে নেই। রুচি পালটে গেছে, জাঁকিয়ে বসছে কবিগান আর দাশু রায়ের পাঁচালী। হরিহর প্রথম প্রথম জমিজমার জন্য চেষ্টা শুরু করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। গ্রামীণ অর্থনীতির কারবারিরা হরিহরকে কোনোভাবেই সাহায্য করে না। এমনকি তার অবস্থাপন্ন জ্ঞাতি-বর্গও তাকে সাহায্য করতে অস্বীকৃত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে জমির মূল্য অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। ফলে খাস জমিজমা যার যেটুকু আছে সেটা হাতছাড়া করতে রাজি ছিল না কেউই। হরিহর এর পরে তার জাত-ব্যবসা, অর্থাৎ পুরুতগিরি আর মন্ত্র দেওয়ার দিকে ঝোঁকে, কিন্তু সেখানেও সুবিধে হয় না। কারণ তদ্দিনে ব্রাহ্মণের সুদিন গেছে, মন্ত্র নেওয়ার লোক পাওয়া যায় না, যারাও বা রাজি হয় তাদের আর্থিক সামর্থ্য তেমন কিছু নয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যে জীবিকা, পুরুতগিরি বা শিষ্যঘর, একশো বছর আগেও যা সুনিশ্চিত আর্থিক সঙ্গতির ভরসা ছিল, তা উনিশ শতকে ফেল করে গেল।[১১]

বাধ্য হয়ে অর্থ উপার্জনের জন্য হরিহরকে বাইরে বেরোতে হয়। কিন্তু পারিবারিক দায় থাকায় হরিহর খুব দূরে যায়নি। সে গেল কৃষ্ণনগর, নদীয়া, বর্ধমান, মানে যে জায়গাগুলো ব্রিটিশ শাসনের আগে পর্যন্ত আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধ ছিল সেখানে। কিন্তু এদের অবস্থাও তখন পড়তির দিকে। সেখানেও শাস্ত্রকথা শোনার লোক নেই, লোক থাকলেও পৃষ্ঠপোষকতা করার মতো টাকা নেই। দুর্গার মৃত্যুর খবর হরিহর পায়নি। কারণ তখন সে দুমাস ধরে কৃষ্ণনগরের পথে পথে ঘুরছিল একটা স্থায়ী বা অস্থায়ী জীবিকার জন্য। একটি ধনী গৃহস্থ বাড়িতে ঢুকে হরিহর একবার মরিয়া হয়ে বলেও ফেলেছিল, 'আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণ – সংস্কৃত পড়া আছে, চণ্ডী পাঠ-টাট করি – তা ছাড়া ভাগবত কি গীতাপাঠও-' [১২]। কিন্তু তারা কিছু না শুনেই ভিখারি ভেবে তাকে বিদায় করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 247 - 256
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই প্রসঙ্গে হরিহরের জীবিকা সম্পর্কে সামান্য আলোচনার দরকার আছে। হরিহর কথকতা করত, সম্ভবত ভালোই করত। শিক্ষিত হওয়ার কারণে তার সংস্কৃতজ্ঞানও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বাধ সাধল সমকালীন রুচি। উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ থেকে কথকতার জনপ্রিয়তা ক্রমশ থিতিয়ে আসতে শুরু করে। এবং বিশ শতকের গোড়াতেই জীবিকা হিসেবে কথকতা প্রসঙ্গিকতা হারায়। হারায় অনেকগুলি কারণে, কিন্তু তার মধ্যে প্রধান ছিল শ্রোতাদের আগ্রহের অভাব। কথকতার মূল শ্রোতা ছিলেন পরিবারের মহিলারা। যেহেতু কথকতায় থাকত প্রগাঢ় ধর্মীয় মোড়ক এবং নীতি-শিক্ষার প্রকোপ, ফলে তা অন্তঃপুরিকাদের জন্য আদর্শ বলে বিবেচিত হত। যেকোনো পালা-পার্বণ, তিথি-আচারে কথকতার আসর বসতো কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের বহির্বাটিতে। মহিলারা চিকের আড়াল থেকে সেই কথকতা শুনতেন। কিন্তু উনিশ শতকের শেষদিকে রুচি পাল্টাতে থাকে। মেয়েদের মধ্যে দাশুরায়ের পাঁচালিগান, নিধুবাবুর টপ্পা[১৩] ক্রমশ জনপ্রিয় হয়, এবং যেটি খুব জরুরি, নারী শিক্ষার প্রসারের ফলে মেয়েদের মধ্যে বই পড়ার প্রবণতা বাড়তে থাকে। ‘চটুল’ এবং ‘সস্তা’ উপন্যাস থেকে তারা বিনোদন খুঁজে নিতে থাকে, কথকতার প্রয়োজন ফুরোয়। সমকালীন একাধিক আত্মজীবনীতে মেয়েদের এই শিফটিং-এর সমর্থন পাওয়া যায়। দীনেন্দ্রকুমার রায় যেমন লিখেছেন,

“আমাদের পল্লী হতে কথকতা উঠিয়াই গিয়াছে। সে কালে যাহারা কথকতা দ্বারা সংসার প্রতিপালন করিতেন, একালে তাহাদের বংশধররা অন্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। গার্লস্কুলের কল্যাণে একালের মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া সেকেলে রামায়ণ, মহাভারত আর স্পর্শ করেন না; এখন তাঁহারা সাহিত্যে আর্ট ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণসূচক, নব্য ঔপন্যাসিকগণের প্রণীত কামায়ণ পাঠে তৃপ্তিলাভ করিতেছেন, রামায়ণে আর মন ওঠে না।”[১৪]

প্রায় একই কথা বলেছেন নবীনচন্দ্র সেনও,

> “...দেখিলাম আমার বাল্যকালে যাহারা পাঠক ছিল, তাহাদের মধ্যে এখন ২/৪ জন যাহারা জীবিত আছে, তাহারাই এখনকার খ্যাতনামা পাঠক। তাহাদের উত্তরাধিকারী আর কেহ গ্রামে জন্মে নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শুনিলাম – দেশে পুঁথি কে শুনে যে পাঠ করিতে কেহ শিক্ষা করিবে। কোন বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আর এ পুঁথি শুনে না। বুঝিলাম স্ত্রীশিক্ষায় দেশ যথার্থই টলায়মান। এ সকল পুঁথির স্থান উপন্যাস গ্রহণ করিয়াছে।”[১৫]

উদ্ধৃত বক্তব্য দুটির মধ্যে নারীশিক্ষাদ্বেষী পুরুষতান্ত্রিক খবরদারি স্পষ্ট, কিন্তু এর থেকে বাস্তব পরিস্থিতি কিছুটা আন্দাজ করা যায়। বোঝা যায় হরিহরের সাবেক পেশা ক্রমশ জমি হারাচ্ছে। অথচ উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও কথকতা অত্যন্ত শক্তিশালী জীবিকা ছিল। মাসিক ৫০০ টাকা রোজকার করা তখন তেমন কঠিন হত না।[১৬] কিন্তু শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই কথকতার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়।

সুতরাং, হরিহরের সমস্যা দ্বিবিধ। প্রথমত, জমি না থাকায় গ্রামে সে থাকতে পারছে না। চাষ-বাস করে দু-মুঠো অন্ন ঘরে না তুলতে পারলে গ্রামঘরে গৃহস্থ পরিবারের টিকে থাকা মুশকিল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী জমানায় ‘টাকা জমি, জমি টাকা’ হয়ে দেখা দেওয়ায়, হরিহর সামান্য জমির সংস্থানও করে উঠতে পারেনি। দশঘরা গ্রামের মহেশ ঘোষ বলে একজন পয়সাওয়ালা সদগোপ একবার হরিহরের কাছে মন্ত্র নিতে ইচ্ছুক ছিল। সেই সঙ্গে কিছু ধানের জমি-টমি দিয়ে হরিহরদের তার গ্রামে উঠিয়েও নিয়ে যেতে চেয়েছিল। প্রস্তাব শুনে হরিহর নিমরাজি হলেও, সর্বজয়া পত্রপাঠ ঘটিবাটি গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে সর্বজয়ার মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য, ‘... –এ গাঁয়ে তোমার আছে কি? শুধু ভিটে কামড়ে পড়ে থাকা –’।[১৭] শেষ পর্যন্ত ঘোষ মশাই-এর আর মন্ত্র নেওয়া হয়নি, হরিহরদেরও দশঘরা গিয়ে ওঠা হয়নি। ‘সর্বজয়া খুব আশায় আশায় ছিল’, স্বভাবতই ‘সংবাদ শুনিয়া আশাভঙ্গ হইয়া পড়িল’। কিন্তু সর্বজয়া এরপরেও কিছুতেই নিশ্চিন্দিপুরে থাকতে চায়নি, স্বামীকে ক্রমাগত খোঁচা দিয়ে গেছে, ‘ওখানে না হয়, অন্য কোথাও দ্যাখো না? বিদেশে মান আছে, এখানে কেউ পোঁছে?’ [১৮] বোঝাই যায় বহু আগে থেকেই রায় পরিবারের বাস্তুত্যাগের পরিকল্পনা চলছিল, দুর্গার মৃত্যু তাকে ত্বরান্বিত করে মাত্র।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 247 - 256
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অন্যদিকে দ্বিতীয় কারণটিও সমান সক্রিয়। কথকতা করে দিন চলছিল না, হরিহরেরও ক্ষমতা ছিল না বিকল্প কোন ব্যবস্থায় অর্থের সংস্থান করে। স্বভাবতই জীবিকার সুযোগ তৈরি না হলে নিশ্চিন্দিপুরে পড়ে থেকে লাভ নেই, ক্রমাগত দারিদ্র্য কে-ই বা সহ্য করতে চায়। ফলে হরিহরকে বেরিয়ে যেতেই হত। সুতরাং উনিশ-বিশ শতকের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিই কার্যত হরিহরকে তিন পুরুষের ভিটে ছাড়তে বাধ্য করে। সে উদ্বাস্তু হয়, এবং কাশী যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

ভেবে দেখলে হরিহরের কাশী যাওয়ার সিদ্ধান্ত একদমই পরিবারের মুখ চেয়ে। যেভাবেই হোক আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনতে হবে, তিনটি মানুষের দু'বেলার অন্ন নিয়মিত জোগাড় করতে হবে, এই ছিল হরিহরের প্রাথমিক ভাবনা। এই ভাবনায় ভুল নেই তেমন। হিন্দুধর্মের পীঠস্থান হওয়ায় কাশীতে জনসমাগম সর্বাত্মক। তাছাড়া প্রবাসী বাঙালীর সংখ্যাও কিছু কম নয়। এবং সবচেয়ে জরুরি কাশীতে কথকতার দীর্ঘ ঐতিহ্য। 'পথের পাঁচালী'-র প্রায় একযুগ বাদে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁর আত্মজীবনী 'অর্ধেক জীবন'-এ বেনারসে কথকতা শোনার অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছিলেন আমাদের।[১৯] হরিহরের কাশীতে গিয়ে প্রথম প্রথম ভালোই রোজকার হচ্ছিল। নতুন উদ্যমে সে পালা লিখছিল, গান লিখছিল, গঙ্গার ঘাটে বসে দু-পয়সা রোজগারেও সমস্যা হচ্ছিল না। কিন্তু বিধির লিখন খণ্ডায় কার সাধ্যি, সব গুছিয়ে তোলার মুখেই মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাকে।[২০]

কিন্তু সবটাই কি বিধির দোষ? বোধহয় না। লেখক বিভূতিভূষণেরও কিঞ্চিৎ দায় এখানে আছে। যেকারণে 'অপমৃত্যু' শব্দটি শিরোনামে ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই অপমৃত্যু কীভাবে, সেটুকু আলোচনা করেই প্রবন্ধের ইতিতে পৌঁছানো যাবে।

৪

পাঠক মাত্রেই খেয়াল করবেন 'পথের পাঁচালী' এবং পরে 'অপরাজিত'-তে বারবার মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। রায় পরিবারের চার জন আদি সদস্যের মধ্যে অপু ছাড়া কেউই বাঁচেনি, এবং যেটি বিস্ময়কর সবকটি মৃত্যুই আকস্মিক। কোনো পূর্বাভাষ নেই, কোনো ইশারা নেই। দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন যেমন নিস্তরঙ্গ কাটে সেভাবেই কাটছিল। দিন গুজরান হচ্ছিল স্বাভাবিক নিয়মে। অথচ তার মধ্যেই এক একটি অপ্রত্যাশিত মৃত্যু যেন আগ বাড়িয়ে এসে ছন্দপতন ঘটিয়ে গেছে।

মৃত্যুগুলো দেখলেই বোঝা যায় এদের একটিরও হওয়ার কথা ছিল না, জোর করে ঘটানো হয়েছে। যেমন দুর্গার মৃত্যু, সবচেয়ে অস্বাভাবিক। ছোটবেলা থেকেই দুর্গা দুরন্ত, বাড়িতে থাকে না বললেই চললে, বনেবাদাড়ে, মাঠে-ঘাটে, পুকুর পাড়ে ঘুরে বেড়াতেই সে বেশি স্বচ্ছন্দ। নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম তার হাতের তালুর মতো চেনা। সেই গ্রামের আনাচে-কানাচে একরকম বনদেবীর মতোই ঘুরে বেড়ায় সে। বস্তুত যে বয়সে অন্য মেয়েরা বিবাহের প্রস্তুতি নিয়ে সলাজ আড়ষ্টতায় দিন কাটায়, সেই বয়সে 'নির্লজ্জ' কুণ্ঠাহীন দুর্গার সময় কাটে গ্রামের জনমানবহীন তালপুকুর আর বটতলায়। এমন একটা চরিত্র আচমকা তিনদিনের জ্বরে মারা গেল, এ রীতিমতো আশ্চর্য। গল্পের শুরু থেকেই অপুর একাধিকবার জ্বরে পড়ার কথা শোনা যায়, কিন্তু দুর্গার এমন কিছু সমস্যা নেই। অন্তত অসুখ হওয়ার আগে ছিল না। তবু একটা তিনদিনের জ্বরে তাকে মরতে হল।

সর্বজয়ার ক্ষেত্রেও কমবেশি একই গল্প। অপু তখন কলেজে পড়ছে, বৃত্তি পাচ্ছে, সর্বজয়া বাড়িতেই। টুকিটাকি চাল-ধান ভেঙে দিন চলে যাচ্ছে। সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও অভাব নেই। ছেলে-অন্ত প্রাণ সর্বজয়ার, ছেলে একটু সংসারী হলেই তার শান্তি। অথচ তার মধ্যেই আচমকা সর্বজয়ার মৃত্যু। একদমই আকস্মিক, অকারণে।

অকারণ মৃত্যু হরিহরের ক্ষেত্রেও। কাশীতে গিয়ে পরিবারের বাকিদের তুলনায় হরিহর অনেকবেশি উজ্জীবিত ছিল। প্রথমত, জীবিকার সুযোগ তৈরি হচ্ছিল। বেশ কিছু বাড়িতে কথকতার বাঁধা কাজ পাওয়া যাচ্ছিল, সন্ধ্যে বেলা গঙ্গার ঘাটে বসলেও রোজগার মন্দ হচ্ছিল না। দ্বিতীয়ত, নিশ্চিন্দিপুরের ক্ষুদ্র গ্রাম্যজীবন এবং সংস্কারের বাইরে কাশীর উন্মুক্ত পরিবেশে ফের একবার শূন্য থেকে পরিবারকে গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ মিলছিল তার। অন্যদিকে আর্থিকচাপ কিছুটা লাঘব হওয়ায় নিজের বহুদিনের লালিত স্বপ্নগুলি নিয়ে ফের নাড়াচাড়াও শুরু করেছিল সে। পালা রচনা করছিল, গান রচনার

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 247 - 256
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কথা ভাবছিল। কিন্তু হরিহর ভাবলে তো হবে না, লেখক কী ভাবছিলেন সেটা জরুরি। তাই "মাঘ মাসের শেষের দিকে একদিন হরিহর হঠাৎ বাড়ী ঢুকিয়াই উঠোনের ধারে বসিয়া পড়িল"।[২১] এবং সেখানেই হরিহরের স্বপ্ন ও সংকল্পের ইতি। সেই অসুস্থতা থেকে হরিহর আর সেরে উঠতে পারেনি।

দেখে-শুনে সন্দেহ হয় বিভূতিভূষণ সচেতনভাবেই যেন চরিত্রগুলিকে সরিয়ে দিয়েছেন। তিনি শুধু অপুর গল্পই বলতে চেয়েছিলেন। বাকিরা সেই কাহিনিতে অপাংক্তেয় না হলেও স্বাগত নয়। হরিহর, সর্বজয়া, দুর্গা কাহিনিতে ততক্ষণই জরুরি, যতক্ষণ তারা অপুর অনুসারী। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে শুরু করলেই মুশকিল। যখনই বাকিরা অপুর ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে, লেখক এবং পাঠকের মনোযোগ দাবি করতে শুরু করেছে, নিজেদের সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলেছে, তখনই যেন তাদের জোর করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্গা নিঃসন্দেহে অপুর থেকে শক্তিশালী চরিত্র, একটা সময়ের পর অপুকে সে রীতিমতো কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বীতার সামনে ফেলছিল, তাই প্রথমে তাকে সরানো হয়। কাশী যাওয়ার পর হরিহরের কর্মতৎপরতা পাঠককে আগ্রহী করতে শুরু করলে, তারও পরিণতি হয় দুর্গার মতোই। সর্বজয়ার ক্ষেত্রে এই প্রবণতা সবচেয়ে নিষ্ঠুর। অপুর তখন এক পা শহরে, এক পা মায়ের কাছে। মাকে নিয়ে তার পিছুটান থেকেই যাচ্ছে, পরিপূর্ণ মুক্তি ঘটছে না। তাই অপুর চিদবৃত্তির উন্মেষ এবং সন্তুষ্টির জন্য সর্বজয়াকেও একরকম স্বেচ্ছামৃত্যুর দিকেই যেন ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

'পথের পাঁচালী' বস্তুত তাই 'অপুর পাঁচালী'। লেখকের কাছে অপু ছাড়া কেউই অপরিহার্য নয়। তাই তিনি অক্লেশে কাঁচি চালিয়ে যান কখনো দুর্গা, কখনো সর্বজয়া, কখনো বা হরিহরের জীবনে। এই অমানবিকতা মারাত্মক, সহানুভূতিশীল পাঠককে আহত করে, ক্ষোভ তৈরি হয়। বস্তুত, আলোচনার শেষে আমাদের অনুযোগও এটুকুই। বাকিদের না হলেও হয়তো হরিহরকে লেখক আর একটু সময় দিতে পারতেন। শিল্পী হরিহরকে প্রতিষ্ঠার একটা সুযোগ দিলে ক্ষতি তো কিছু ছিল না। জীবনযুদ্ধে অনেক মানুষই হারে, কিন্তু হরিহর তো যুদ্ধ করার সুযোগটুকুও পেল না।[২২]

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক-প্রাবন্ধিক গৌতম ভদ্র তাঁর একটি প্রবন্ধের উপসংহার টেনেছিলেন হরিহরকে দিয়ে। বিষণ্ণতা মিশেছিল শেষকথাগুলিতে। তাঁর সেই বিষণ্ণতার রেশটুকু উদ্ধৃত করে এই আলোচনার ইতি টানা যেতে পারে,

> "... সেই কবে খবর পেয়েছি কাশীতে মারা গেছেন হরু ঠাকুর, নিশ্চিন্দিপুরের হরিহর রায়। আর কে পালা বাঁধবে তাঁর মতো? ... আরও শুনেছি যে অপু আজও স্বপ্ন দেখে, এই দরিদ্র, নিষ্পেষিত দেশে, নিষ্ক্রিয় সময়ে প্রতিদিন তার কানে ভেসে আসে তার বাবার, কথক হরিহরের, আশীর্ব্বচনের রেশ:
> কালে বর্ষতু পর্জ্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী.../ লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ..."[২৩]

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৯৩, কলকাতা, পৃ. ৮২

'কবির গুরু, ঠাকুর হরু' – উনিশ শতকের দাপুটে কবিয়াল হরু ঠাকুর নিয়ে প্রচলিত এই স্তুতিবাক্যটি বিভূতিভূষণের পছন্দ ছিল বলেই মনে হয়। তাঁর একাধিক উপন্যাসে উপমাটি ফিরে ফিরে এসেছে। যেমন, 'ইছামতী'-তে মেজ বৌ বিলু ভবানী বাঁড়ুজ্জ্যেকে শ্লেষ করে বলে, '-আহা রে, কি যে কথার ভঙ্গী! কবির গুরু, ঠাকুর হরু – হরু ঠাকুর এলেন।...'

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভভূতিভূষণ, রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, পঞ্চম মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৯৪, কলকাতা, পৃ. ১৯১

৩. ঐ, পৃ. ১৯১

৪. ঐ, পৃ. ১৯১)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 247 - 256
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হরিহর এই সময় – “রাত্রে স্ত্রীর কাছে গল্প করিত – বাজারের বারোয়ারীতে কবির গান হচ্চে বুঝলে? ব’সে ব’সে শুন্‌লাম, বুঝলে?......সোজা পদ সব...কিছুই না, রও না, সংসারটা একটু গুছিয়ে নিয়ে বসি ভাল হ’য়ে – নতুন ধরনের পালা বাঁধবো – এরা সকলে গায় সেই সব মান্ধাতা আমলের পদ - ...”

৫. ঘোষ, বিনয়, ‘বাংলার নবজাগৃতি’, প্রথম ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান মুদ্রণ, ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ৪৫

৬. বিনয় ঘোষ এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের রাজস্ব আদায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কোম্পানির বকেয়া মেটানোর পরও জমিদারদের হাতে যা থেকে যাচ্ছিল, তার পরিমাণ নেহাত কম নয়। তবু যে বহু পুরাতন জমিদারি নিলামে উঠল, তার কারণ বেলাগাম ভোগলালসা, অপসংস্কৃতি, এবং নাগরিক ব্যভিচার। ইংরেজদের নতুন জমিদারী ব্যবস্থা সেগুলি ধ্বংস হওয়ার জন্য দায়ী ছিল না। অপরপক্ষে বদরুদ্দিন ওমর কিন্তু ভিন্ন অবস্থান নিয়েছেন। ওমরসাহেব দেখিয়েছেন, ১৭৯৩ সালে যখন প্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লাগু হয়, তখন জমিদারি পিছু যে রাজস্ব নির্দিষ্ট করা হয়, তার পরিমাণ অনেকখানি। সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও এই রাজস্ব আদায় করা অনেকক্ষেত্রেই পুরাতন জমিদারদের পক্ষে সম্ভব হত না। এই অপারগতার অনিবার্য পরিণতি ছিল মহাজন-বেনিয়াদের কাছ থেকে ধার-দেনা, শেষে ধারের বোঝা গুরুভার হলে জমিদারী নিলাম। বিভূতিভূষণের ‘বিপিনের সংসার’ কিংবা তারাশঙ্করের ‘ধাত্রীদেবতা’, ‘কালিন্দী’ উপন্যাসে এই ধরনের পুরাতন জমিদার বংশগুলির দুরবস্থার চিত্র কিছু কিছু দেখা যায়। (দ্রষ্টব্য - বিনয় ঘোষের ‘বাংলার নবজাগৃতি’, বদরুদ্দিন ওমরের ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক’)

৭. বস্তুত, উনিশ শতকে জমিদারী পুঁজিসঞ্চয়ের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছিল। ইংরেজরা আসার পর প্রথম প্রথম দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো কিছু ভারতীয় ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যবসা করলেও, তাঁরা বেশীদিন এঁটে উঠতে পারেননি। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁরা ঝোঁকেন জমিদারী বা পরগনা কেনার দিকে। উনিশ শতকে জমিদারী থেকে বিলক্ষণ দু’পয়সা লাভ ছিল। বিনয় ঘোষ, গোপাল হালদার প্রমুখ বামপন্থী গবেষকদের আলোচনায় সে প্রসঙ্গ বারবার উঠে এসেছে।

৮. রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। বিহারী-মহেন্দ্র থাকত কলকাতায়। দুজনেই সমান উদ্যমহীন, অলস। পড়াশুনো তাদের কাছে শৌখিনতা, নেহাত করতে হয় বলেই করা। কিন্তু এদের অর্থের অভাব ছিল না, উৎস ছিল জমিদারী। বিহারীর যেমন নদীয়ায়, মহেন্দ্রের তেমন বারাসতে। সেসব জায়গা থেকে ঋতুভিত্তিক অর্থ এবং শস্য নিয়মিত পৌঁছে যেত কলকাতার বাড়িতে।

৯. ‘বাংলার নবজাগৃতি’-র পূর্বোদ্ধৃত সংস্করণ, পৃ. ৪৬

১০. ‘ইছামতী’-র পূর্বোদ্ধৃত সংস্করণ থেকে তথ্যদুটি গৃহীত। পৃষ্ঠা যথাক্রমে ৯৮ এবং ২২৬)

সাংস্কৃতিক রদবদলের বেশ স্পষ্ট ছবি মেলে ‘ইছামতী’ উপন্যাসে। ভবানী তার তিন বৌকে কিছুদিন উপনিষদ পড়ানোর চেষ্টায় ছিলেন। স্বভাবতই ব্যর্থ হন। ভবানী তখন মহাবিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, ‘– বাংলা দেশে এর চর্চ্চা নেই। এখানে এসে দেখচি শুধু মঙ্গলচণ্ডীর গীত আর মনসার ভাসান আর শিবের বিয়ে – এই সব। বড্ড জোর ভাষা-রামায়ণ-মহাভারত।’ চণ্ডীর গীত খারাপ লাগলেও, দাশরথী রায়ের ভক্তিমূলক পাঁচালী কিন্ত ভবানীর মনে ধরেছিল। উলোতে বাবুদের বাড়িতে দাশরথী গাইতে এলে ভবানী গিয়ে শুনে আসেন। বড়ো বৌ তিলুকেও তিনি দাশরথির বেশ কিছু গান শিখিয়েছিলেন। মঙ্গল গান থেকে এভাবে দাশরথি রায়ে সরে আসা, উনিশ শতকের গ্রামবাংলায় পালটে যাওয়া সাংস্কৃতিক রুচির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১১. ব্রাহ্মণের সামাজিক অবনমনও এই সময় থেকেই। ‘ইছামতী’ উপন্যাসে এর একটি চমৎকার নমুনা আছে। সেখানে হঠাৎ বড়োলোক কিন্তু নিম্নবর্ণের নালু পালের বাড়িতে দুর্গাপুজোর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন গ্রামের কুলীন ব্রাহ্মণেরা। কিন্তু নালুকে জব্দ করা যায়নি। সে পাশের গ্রামগুলি থেকে নগদ অর্থমূল্যে কয়েকশো ব্রাহ্মণ ভাড়া করে আনে এবং তাদের প্রকাশ্যে ভোজন করায়।

১২. ‘পথের পাঁচালী’র পূর্বোদ্ধৃত সংস্করণ, পৃ. ১৫২

১৩. 'ইছামতী'র পূর্বোদ্ধৃত সংস্করণ, পৃ. ২৪৭)

'ইছামতী' উপন্যাসে নদীর ঘাটে স্নান করার ফাঁকে গ্রামের মেয়ে-বৌদের অনুরোধে নিস্তারিণী একটি নিধুবাবুর টপ্পা গেয়েছিল, 'ভালবাসা কি কথার কথা সই/ মন যার মনে গাঁথা/ শুকাইলে তরুবর বাঁচে কি জড়িত লতা -/ প্রাণ যার প্রাণে গাঁথা-'। শুনে মুগ্ধ হয়ে সবাই, দাবি উঠছিল আরও গান শোনানোর জন্য।

১৪. 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', সম্পাদনা : গৌতম ভদ্র এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২৪১

গৌতম ভদ্রের 'কথকতার নানা কথা' প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। প্রবন্ধটি সঙ্কলিত হয়েছে 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' বইতে।

১৫. ঐ, পৃ. ২৪১

১৬. কথকদের উপার্জন সংক্রান্ত তথ্যের জন্য গৌতম ভদ্রের পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধ, পৃ. ২০৩, ২০৪

১৭. 'পথের পাঁচালী'র পূর্বোদ্ধৃত সংস্করণ, পৃ. ৩৫

১৮. ঐ, পৃ. ৫৬

১৯. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'অর্ধেক জীবন', প্রথম প্রকাশ, পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৭, পৃ. ২০৭

২০. মহানন্দ-সংক্রান্ত তথ্যের জন্য: চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার, 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়', প্রথম প্রকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, আষাঢ় ১৩৯৩, পৃ. ১, ২

এই প্রসঙ্গে একটি জরুরি তথ্য দেওয়ার যেতে পারে। সমালোচকরা বিভিন্ন সময়ে দেখিয়েছেন হরিহর চরিত্রটি আসলে বিভূতিভূষণের বাবা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদলে তৈরি। হরিহরের মতো মহানন্দও কাশীতে শাস্ত্র পড়তে গিয়েছিলেন, জীবিকা হিসেবে কথকতাকে গ্রহণ করেছিলেন। সেযুগের বিখ্যাত কথক উদ্ধব শিরোমণি ছিলেন তাঁর গুরু। কথকতায় মহানন্দের যথেষ্ট পসার হয়েছিল। আশেপাশের গ্রাম আড়ংঘাটা-কৃষ্ণনগর তো বটেই, কলকাতা-রংপুর, এমনকি পাটনা-মুঙ্গের-আগ্রা থেকেও তাঁর ডাক আসত। তবে তিনি কখনো কাশী গিয়ে কথকতা করেছিলেন এমন তথ্য নেই।

২১. 'পথের পাঁচালী'র পূর্বোদ্ধৃত সংস্করণ, পৃ. ১৯৮

২২. এখানে একটা বিকল্প প্রস্তাব রাখা যেতে পারে। গৃহত্যাগের সময় যদি পুণ্যভূমি কাশীর বদলে পাপের শহর কলকাতা নির্বাচন করত হরিহর, তাহলে তার কিঞ্চিৎ সুবিধে হতে পারত। জীবিকার দিক থেকে, কবিয়াল হওয়ার পুষে রাখা স্বপ্নের দিক থেকেও। কাশীর তুলনায় কলকাতা অনেকবেশি সম্ভাবনায়। কে না জানে রাজধানী কলকাতায় তখন শয়ে শয়ে জমিদার, তাদের ঘিরে আমোদগেঁড়ে মানুষের ভিড়, মন জোগানোর জন্য নিত্যনতুন মজার খোঁজ। কৃতকর্মা শিল্পীদের নাম হয় সেখানে, সম্মান, অর্থও। অন্যদিকে ভেবে দেখলে কাশীতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কার্যত হরিহরের কবি হওয়ার স্বপ্নের মৃত্যু ঘটে। কারণ কাশীতে কথকতা চলতে পারে, কবিগান নয়। কবিগান উনিশ শতকের দান, নবগঠিত কলকাতা শহরের ফসল, নগরের রুচি অনুযায়ী তার সৃষ্টি এবং বিবর্তন। কলকাতার বিভিন্ন বর্গের শ্রোতা এবং পৃষ্ঠপোষকদের চাহিদায় কবিগান সেকালের অন্যতম শক্তিশালী সাংস্কৃতিক মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দুই কবিকে লড়িয়ে দিয়ে রাতভোর উত্তেজনা এবং উল্লাস, আগমনী গানের আত্মনিবেদন থেকে খেউড়ের নীচ অশ্লীলতা, এর সবটাই নিপাট নাগরিক প্রত্যাশার ফসল। কলকাতা থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলেও যখন কবিগান ছড়িয়ে পড়েছে, তখনও সে এই বিক্ষুব্ধ নাগরিক অস্বস্তিতে বহন করে নিয়ে গেছে। কাশীতে কবিগানের এই পরিবেশ কোথায়? কাশী সনাতন ধর্মের পীঠস্থান, যাবতীয় রক্ষণশীলতার প্রতীক। ভারাক্রান্ত বিধবা বা বৃদ্ধ জীবনের ধীর-স্থির-সহিষ্ণুতার প্রতীক। বস্তুত কাশীর মৌলচরিত্রই কবিগানের বিরোধিতা করে। তাই কাশীতে হয়তো হরিহরের রোজকারের সুযোগ তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু স্বপ্নের মৃত্যু ঘটেছিল। হরিহরের সমসাময়িক আর একটি চরিত্র কিন্তু কলকাতা গিয়েছিল এবং সফল হয়েছিল, সে খেতু। ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসের এই চরিত্রটি সব দিক থেকেই পিছুটানহীন, আধুনিক। দরিদ্র বিধবা মাকে ছেড়ে তার শহরে যেতে কষ্ট হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কলকাতায় একবার পৌঁছনোর পর তার মনের আড় অনেকখানি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 247 - 256
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভেঙে যায়। সে ইংরেজি শেখে, নিষিদ্ধ 'বরখ' খায়, নারীশিক্ষায় উৎসাহী হয়ে ওঠে। যদিও খেতুর মধ্যে বাড়তি কিছু নীতিবোধ ঢুকিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ চরিত্রটির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেননি, কিন্তু গ্রাম ছেড়ে জীবনধারণের জন্য যে কলকাতায় আসতেই হবে তা নিয়ে কোন সংশয় রাখেননি। এদিক থেকে হরিহরের তুলনায় খেতু আধুনিক। হরিহর আর খেতুর বৃত্তি যদিও আলাদা, ব্রিটিশ শাসনে কলোনির চরিত্র এবং সেখানে আর্থিকভাবে সফল হওয়ার উপায় খেতু আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল।

২৩. গৌতম ভদ্রের পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধ, পৃ. ২৫১